জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল

National Institute of Mass Communication Journal

বর্ষ ৪ | সংখ্যা ৪ | ১৪২৭
Year 4 | Volume 4 | 2021

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল
১২৫/এ, এ.ডব্লিউ.চৌধুরী রোড
দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

www.nimc.gov.bd

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল

National Institute of Mass Communication Journal

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল

National Institute of Mass Communication Journal

বর্ষ ৪	সংখ্যা ৪	১৪২৭
Year 4	Volume 4	2021

উপদেষ্টা

শাহিন ইসলাম, এনডিসি

সম্পাদক

মো. জাহিদুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক

আইরিন সুলতানা

সম্পাদনা পরিষদ

মহাপরিচালক

অতিরিক্ত মহাপরিচালক

পরিচালক (প্রশি. অনু.)

উপ-পরিচালক (দৃশ্যসজ্জা ও রেখা. প্রশি.)

উপ-পরিচালক (ক্যামেরা ও আলোকসম্পাত প্রশি.)

উপ-পরিচালক, (গবেষণা, চ. দা.)

গবেষণা কর্মকর্তা

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল

National Institute of Mass Communication Journal

বর্ষ ৪	সংখ্যা ৪	১৪২৭
Year 4	Volume 4	2021

সম্পাদক	:	মো. জাহিদুল ইসলাম
নির্বাহী সম্পাদক	:	আইরিন সুলতানা
প্রকাশক	:	মহাপরিচালক জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা	:	মো. সোহেল পারভেজ
কম্পিউটার কম্পোজ	:	মোছা. সাজেদা খাতুন
পৃষ্ঠাসজ্জা ও মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা	:	ঊষা এ্যাড ৬-এ/৪, ব্লক-এফ, কাঁচা বাজার রোড কৃষি মার্কেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
মূল্য	:	১০০.০০ (একশত) টাকা
Price	:	100.00 (One Hundred) Taka
পরিবেশক	:	জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

যোগাযোগ

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

১২৫/এ, দারুস সালাম, এ. ডব্লিউ. চৌধুরী রোড, ঢাকা-১২১৬।

ফোন: ৫৫০৭৯৪২৮, ফ্যাক্স: +৮৮০২৫৫০৭৯৪৪৩

e-mail: dg@nimc.gov.bd

Website : www.nimc.gov.bd

Contact

National Institute of Mass Communication

125/A, Darus Salam, A. W. Chowdhury Road, Dhaka-1216.

Phone : 55079428, Fax: +880255079443

e-mail: dg@nimc.gov.bd

Website : www.nimc.gov.bd

মুখবন্ধ

'জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল'-এ গণমাধ্যম ও সংবাদিকতা, গণযোগাযোগ, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি, চলচ্চিত্র, মঞ্চ নাটক, টেলিভিশন, বেতার, কমিউনিটি রেডিও সম্পর্কিত মৌলিক ও গবেষণাধর্মী প্রভৃতি লেখা স্থান পেয়ে থাকে।

২০২০-২১ অর্থবছরে জার্নালের বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশ হতে যাচ্ছে মোট ৮টি লেখা। নানা পেশার সুলেখকগণ আমাদের আহবানে লেখা পাঠিয়েছেন। আমরা সচেষ্ট ছিলাম লেখার মানের উন্নয়নসহ জার্নালটিকে সুন্দর ও নির্ভুল করতে। কোনো ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে বা যেকোনো বিষয়ে উন্নয়ন পরামর্শ থাকলে তা আমাদের জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো। আশা করি আগামীতে আপনাদের সকলের পরামর্শ ও সহযোগিতায় 'জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল' পরিপূর্ণ ও সমুন্নত হয়ে উঠবে।

'জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল'-এর ৪র্থ সংখ্যা মলাটবন্দি হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ সংখ্যা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। পরিশেষে, জার্নালের ৪র্থ সংখ্যা প্রকাশে সার্বিক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সকলের প্রতি রইলো বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

শাহিন ইসলাম, এনডিসি
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

সম্পাদকীয়

অদৃশ্য এক শত্রু! কী তার অসীম শক্তি! প্রায় তছনছ করে ফেলেছে পুরো পৃথিবীকে। ইতোমধ্যে বিশ্বের বুক থেকে কেড়ে নিয়েছে ২৬ লাখেরও বেশি মানুষের প্রাণ। দেশে দেশে হাহাকার। কান্নার রোল! বিশ্বের বুকে নির্মিত হচ্ছে এক নতুন ইতিহাস। তবু এর মাঝেও বয়ে যাচ্ছে জীবন। যাপিত প্রাণ মানিয়ে নিচ্ছে নব্য-স্বাভাবিকতাকে। এমন এক ঐতিহাসিক করোনাকালে প্রকাশিত হলো জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের গবেষণা সাময়িকী 'জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল'-এর চতুর্থ সংখ্যা। সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

এ সংখ্যার লেখাগুলোতে প্রাধান্য পেয়েছে নাগরিক সাংবাদিকতার গুরুত্ব, সিকান্দার আবু জাফরের গল্পে গ্রামীণ জীবন, ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পূর্বাপর, সিকদার আমিনুল হক ও লিটল ম্যাগাজিন চর্চা, এইচআইভি/এইডস ইত্যাদি বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ, বিজ্ঞাপনচিত্রে নারীর উপস্থিতি, ছাদবাগান বিস্তারে গণমাধ্যমের ভূমিকা। সবমিলিয়ে প্রবন্ধ রয়েছে ০৮ (আট) টি। লিখেছেন দেশের খ্যাতনামা লেখক, গবেষক, সাংবাদিকরা। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তাঁদের অসামান্য লেখার কল্যাণেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে এ সংখ্যা। বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকেও এ সংখ্যাটি মূল্যবান হয়ে থাকবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

নাগরিক সাংবাদিকতার প্রভাব নিয়ে 'কীভাবে নাগরিক সাংবাদিকতা বাংলাদেশি গণমাধ্যমে সংবাদ তৈরি প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে' শিরোনামে অত্যন্ত সময়পোযোগী একটি প্রবন্ধ লিখেছেন ড. মো. আবদুল কাবিল খান। সিকান্দার আবু জাফর বাংলা সাহিত্যের এক কিংবদন্তী লেখক। তাঁর ছোটগল্পগুলো শুধু বাংলা সাহিত্যেরই নয়, বিশ্বসাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। তাঁর গল্পে বাংলার গ্রামীণ জীবনের উপস্থিতি নিয়ে একটি বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ লিখেছেন সুলেখক ও গবেষক মুহম্মদ মাহমুদুর রহমান। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব' শিরোনামে একটি তথ্যবহুল লেখা লিখেছেন অ্যাডভোকেট সাহিদা বেগম। এ প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও বঙ্গবন্ধুর লড়াই-সংগ্রাম-আত্মত্যাগের ইতিহাস। ইতিহাসের এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়গুলো বারবার নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা জরুরি। আশা করি অ্যাডভোকেট সাহিদা বেগমের এ লেখার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম আপোষহীন, নির্ভীক ও ত্যাগী এক বঙ্গবন্ধুকে চিনতে পারবে। বাংলা সাহিত্যের

একজন কালজয়ী কবি সিকদার আমিনুল হক। তিনি যুক্ত ছিলেন লিটল ম্যাগাজিন ‘স্বাক্ষর’-এর সঙ্গে। ‘স্বাক্ষর’সহ বাংলাদেশের লিটল ম্যাগাজিন চর্চার এক দারুণ ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন গবেষক ও লেখক শামীম রফিক তাঁর ‘স্বাক্ষর, সিকদার আমিনুল হক এবং লিটল ম্যাগাজিনের পরবর্তী অবস্থা’ শীর্ষক প্রবন্ধে।

এছাড়া গণসাংবাদিকতা ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে লিখেছেন ড. এ. কে. এম. আনিসুর রহমান, এইচআইভি/এইডস নিয়ে লিখেছেন ড. জিল্লুর রহমান পল এবং বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনচিত্রে নারী নিয়ে লিখেছেন মোহাম্মদ ফেরদাউস খান শাওন। অন্যদিকে, ঢাকা শহরে ছাদবাগানের বিস্তারে গণমাধ্যমের প্রভাব নিয়ে একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখেছেন কামরুজ্জামান।

লেখকদের প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের অকৃত্রিম সহযোগিতার জন্য। আরও কৃতজ্ঞতা জানাই জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহিন ইসলাম, এনডিসি মহোদয়কে এবং সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দকে। মহাপরিচালক মহোদয়ের নির্দেশনা এবং সম্পাদনা পরিষদের প্রত্যক্ষ উদ্যোগ ও পরিচর্যার ফলে সমায়িকীটি সুন্দরভাবে মুদ্রণ করা সম্ভব হয়েছে। জার্নালের চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশে সার্বিক সহযোগিতার জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের প্রতি।

‘জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল’-এর চতুর্থ সংখ্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলের মঙ্গল কামনা করি।

ঢাকা
মার্চ ২০২১

মো. জাহিদুল ইসলাম
পরিচালক (প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান)

সূচিপত্র

কীভাবে নাগরিক সাংবাদিকতা বাংলাদেশি গণমাধ্যমে সংবাদ তৈরি প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে ১১
ড. মো. আবদুল কাবিল খান

সিকান্দার আবু জাফরের গল্পে গ্রামীণ জীবনের কথকতা ২৫
মুহম্মদ মাহমুদুর রহমান

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৩৫
অ্যাডভোকেট সাহিদা বেগম

স্বাক্ষর, সিকদার আমিনুল হক এবং লিটল ম্যাগাজিনের পরবর্তী অবস্থা ৪৯
শামীম রফিক

Role of Public Journalism towards Achieving Socio-Economic Development of a Nation ৬৭
Dr. A. K. M. Anisur Rahman

Investigation of AIDS Stories in Newspapers: An Empirical Evidence in Bangladesh ৮৯
Dr. Jillur Rahaman Paul

Social Representation of Women in Contemporary Bangladeshi Advertisements ১১৯
Mohammad Ferdous Khan Shawon

Impact of Mass Media on Expanding Rooftop Gardening in Dhaka City of Bangladesh ১৩৫
Kamruzzaman

কীভাবে নাগরিক সাংবাদিকতা বাংলাদেশি গণমাধ্যমে সংবাদ তৈরি প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে

ড. মো. আবদুল কাবিল খান

ভূমিকা

এখন নাগরিকদের হাতের মুঠোয় ইন্টারনেট। মোবাইল ফোন থেকেই ছবি বা ভিডিয়ো করে সরাসরি ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা যায়। আপলোড করে দেয়া যায় টেক্সট। আর দিনে-রাতে ২৪ ঘণ্টার এ সুবিধার কারণে কখনো কখনো ব্যক্তিই হয়ে উঠছেন একজন স্বাধীন ব্রডকাস্টার। নানা সীমাবদ্ধতার কারণে মূলধারার গণমাধ্যমে কোনো ঘটনা যদি না আসে বা তারা কৌশলে এড়িয়ে যেতে চাইলেও অনেক সময় পারেননি । কারণ ফেসবুকে রাখঢাকহীন আলোচনার সাথে তথ্য-প্রমাণ হাজির হওয়ার পর অনেক ঘটনাই লাল রঙে শিরোনাম হয়েছে পত্রিকার পাতায়, আর তাতে নড়েচড়ে বসতে হয়েছে অনেককেই।

বিগত কয়েক বছরে আমাদের দেশে বেশ কিছু আলোচিত ঘটনা ঘটেছে যা আমরা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম থেকে সবার আগে জানতে পেরেছি। এসব ঘটনা পরবর্তিতে মূলধারার গণমাধ্যমের জন্য সংবাদের উপকরণ হওয়ার পাশাপাশি দিনের প্রধান শিরোনামে স্থান পেয়েছে। আলোচিত এসব ঘটনা কীভাবে বাংলাদেশের মূলধারার গণমাধ্যমে সংবাদ তৈরির প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে এবং এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন- এ নিয়ে লেখা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধটি। নাগরিক সাংবাদিকতার প্রভাবে কখনও মূলধারার সাংবাদিকতা ঝুঁকির মুখে পড়ছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের সময় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, মূলধারার সাংবাদিকতায় নৈতিকতা না মানার কারণ কী এবং নতুন ধারার গণমাধ্যমে লোকবলের দক্ষতা বাড়াতে কী প্রয়োজন-এসবই আলোচ্য প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।

সময় এখন ইউজার জেনারেটেড কনটেন্টের

গণমাধ্যম, এমনকি রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারক মহল ও বিচারব্যবস্থাকেও দারুণভাবে প্রভাবিত করছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। অনেক ঘটনাকে যেমন ধামাচাপা পড়তে দেয়নি, আবার অনেক ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে বিচারের আগেই হয়রানি করার সংস্কৃতিও।

প্রথাগতভাবেই সংবেদনশীল সংবাদ প্রচারের সময় নীরবতা বা ঘটনাকে দেরিতে প্রকাশ করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। নাগরিক সাংবাদিকদের কনটেন্ট (User-generated content), ডিজিটাল সংবাদ এবং ধারাবাহিক লাইভ স্ট্রিমিং একটি সংবাদকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচার করে।

ছবি, ভিডিয়ো, টেক্সট বা অডিয়ো কনটেন্ট যখন একজন ব্যবহারকারী নিজে ধারণ করেন, তা আবার অনলাইনে প্রচার করেন, তখন ওই কনটেন্টকে ইউজার জেনারেটেড কনটেন্ট বলা হয়। আর কনটেন্ট সংগ্রহ, তৈরি এবং প্রচারের কাজটি সাধারণ ব্যবহারকারী বা নাগরিক করে থাকেন বলে তাকে নাগরিক সাংবাদিক এবং এই কার্যপ্রবাহকে নাগরিক সাংবাদিকতা বলা হয়। মূলধারার গণমাধ্যমে তা সংবাদ হওয়ার জন্য অবশ্যই সেই উপজীব্য থাকা চাই। অনলাইনে কোনো কিছু লিখে দেয়ার নামই নাগরিক সাংবাদিকতা নয়।

নাগরিক সাংবাদিকতার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জ্যা রোসেন বলেছেন, যখন দর্শক বা পাঠক হিসেবে পরিচিত সাধারণ মানুষ তাদের কাছে থাকা গণমাধ্যমে ব্যবহার্য সরঞ্জাম দিয়ে একে অন্যকে তথ্য জানানের কাজ করে থাকে তাকেই নাগরিক সাংবাদিকতা বলা হয়।

নিউইয়র্কভিত্তিক তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক অনলাইন সাময়িকীতে (পিসিম্যাগ) নাগরিক সাংবাদিকতাকে বৃহত্তর পরিসরে খবর বা প্রতিবেদন প্রকাশ করার কথা বলা হয়। একে সহযোগী নাগরিক সাংবাদিকতা বা তৃণমূল পর্যায়ের মিডিয়াও বলা যেতে পারে। গণমাধ্যমে নাগরিক সাংবাদিকদের কনটেন্ট প্রচারের উপযোগী হলে তখন সোর্সের সঙ্গে যোগাযোগ এবং তা যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রচারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অন্যথায় মিথ্যা সংবাদ (ফেক নিউজ) প্রচার হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

ইউজার জেনারেটেড কনটেন্ট বা ইউজিসির প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে :

(১) এখানে প্রতিষ্ঠানের নয়, বরং ব্যবহারকারীর মতামত প্রকাশ পায়।

(২) এটিকে সৃজনশীল কনটেন্ট হিসেবে ধরা হয় এবং ব্যবহারকারী নতুন কিছু সংযোজন করার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

(৩) সাধারণত ইউজিসি প্রচার পায় অনলাইনে এবং তা অন্যসব ব্যবহারকারীর জন্য উন্মুক্ত থাকে। (কাবিল, ২০২০: ৪০)

নাগরিক সাংবাদিকতা বাংলাদেশের মূলধারার সংবাদমাধ্যমে সংবাদ তৈরির প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের জনপ্রিয়তা আমাদের দেশে তুঙ্গে থাকার কারণেই ছোট-বড় ঘটনাগুলো আলোচনায় চলে আসছে। বিগত পাঁচ-ছয় বছরে নাগরিক সাংবাদিকদের দেয়া অনেক সংবাদ মূলধারার গণমাধ্যমে জায়গা করে নিয়েছে। যেমন:

গত ২২ অক্টোবর ২০১৯ সাভারের ডগরমোড়া এলাকায় নক্ষত্রবাড়ি নামের ভবনের ছাদবাগানের গাছ কেটে ফেলেন খালেদা আক্তার লাকি। গাছ কাটার ভিডিয়ো মোবাইলে ধারণ করে ওই দিনই ৫টা ৫৮ মিনিটে সুমাইয়া হাবিব নামের অপর এক নারী তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেন।

দশ লাখেরও বেশি ভিউ হওয়া ভিডিয়োটি ভাইরাল হলে অনলাইনে প্রতিবাদ শুরু হয়। পুলিশ খালেদা আক্তারকে আটকও করে। বিষয়টি এড়িয়ে যেতে পারেনি মূলধারার গণমাধ্যম। দ্রুত গণমাধ্যমের নজরে এলে প্রিন্ট, অনলাইন ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এ নিয়ে সংবাদ প্রচার করে, এমনকি সংবাদ বিশ্লেষণমূলক টকশোর প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে। ভাইরাল হওয়া সেই ৪ মিনিট ৫৫ সেকেন্ডের ভিডিয়োটি বেশ কয়েকটি টিভি চ্যানেলে প্রচার হতে দেখা যায়। সংবাদমাধ্যম থেকে জানা যায়, প্রতিহিংসার বশে গাছগুলো কাটেন লাকি, আর বিচার পাওয়ার আশায় ফেসবুকে ভিডিয়ো পোস্ট করেন সুমাইয়া হাবিব।

মূলধারার গণমাধ্যমে ইউজিসি কনটেন্টের ব্যবহার নিয়ে প্রথম আলো ডিজিটালের নির্বাহী সম্পাদক সেলিম খান বলেন, আধুনিক সাংবাদিকতায় নাগরিক সাংবাদিকতাকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। শুধু কন্টেট উপভোগ নয়, বরং পাঠকেরাই এখন সংবাদ তৈরিতে নিজেদের অংশগ্রহণ দেখতে চায়।

প্রতিদিন প্রথম আলো অনলাইনে আসা পাঠকদের মতামত থেকেই তা স্পষ্ট আমরা অনুধাবন করতে পারি। প্রথম আলো শুরু থেকেই নাগরিক সাংবাদিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। নাগরিক সাংবাদিকদের জন্য একসময় প্রথম আলো ব্লগ প্ল্যাটফর্ম চালু করেছিল; যদিও পরে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। এর পরে প্রবাসীদের জন্য চালু হয় দূরপরবাস। যেখানে প্রবাসীরা তাদের প্রবাস জীবনের নানা বিষয় নিয়ে নিয়মিত লিখছেন। নাগরিক সাংবাদিকতায় প্রথম আলোর সর্বশেষ সংযোজন হচ্ছে নাগরিক সংবাদ। পাঠকরা আশপাশে ঘটে যাওয়া যেকোনো ঘটনা বা যেকোনো বিষয়ে নাগরিক সংবাদে লেখা পাঠাতে পারেন।

নাগরিক সাংবাদিকতাকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে গণমাধ্যমগুলো বিভিন্ন উদ্যোগ নিতে পারে। নাগরিক সাংবাদিকতার জন্য আলাদা মোবাইল অ্যাপস চালু করতে পারে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মাঠ পর্যায়ের নাগরিক সাংবাদিকরা এই অ্যাপস ব্যবহার করে দ্রুত খবর পাঠাতে পারবেন। রাশিয়ার বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল লাইফ নিউজ 'লাইফ কর' নামে ২০১৫ সালে এমনই একটি মোবাইল অ্যাপস চালু করেছিল। যদিও লোকসানের মুখে পড়ে ২০১৭ সালের ১৮ আগস্ট টেলিভিশন চ্যানেলটির সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। কোথাও কোনো বড? ধরণের ঘটনা বা ব্রেকিং নিউজ ঘটলেই ব্যবহারকারীর মোবাইলে নোটিফিকেশন পৌঁছে যেত। ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা নাগরিক সাংবাদিককে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ওই খবরের ছবি বা ভিডিয়ো পাঠানোর আহবান জানানো হয় ওই অ্যাপের মাধ্যমে। যিনি সবার আগে এবং কনটেন্টের মান বজায় রেখে ভিডিয়ো পাঠাতে পারেন, তাঁর সঙ্গে পরবর্তিতে বার্তাকক্ষ থেকে যোগাযোগ করে খবরের সত্যতা যাচাই-বাছাই করা হয়। উপযুক্ত প্রমাণ মিললেই খবরটি প্রচারযোগ্য হয় এবং ওই নাগরিক সংবাদদাতার মোবাইল ফোনে নির্দিষ্ট একটা সম্মানী পাঠানো হয়। আমাদের দেশের গণমাধ্যমগুলো এই ধরণের প্রকল্প চালু করতে পারে। পাশাপাশি সংবাদ পোর্টালগুলোতে নাগরিক সাংবাদিকতার নীতিমালা প্রকাশ করে রাখতে পারে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'সামাজিক আন্দোলন'

তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তি আধুনিক বিশ্বে সামাজিক আন্দোলনসহ প্রায় সব অঙ্গনেই প্রভাব বিস্তার করছে। ইন্টারনেট তথা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে সুসংগঠিত হয়ে যেকোনো সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যে যে পৌঁছানো

যায় তা আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঘটে যাওয়া আন্দোলন থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। তুরস্কের ইস্তাম্বুলের গেজি পার্ক, মিশরের কায়রোর তাহরির স্কোয়ার কিংবা নিউইয়র্কের ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলনের সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দাবি আদায়ে সোচ্চার ছিল মানুষ। তরুণ প্রজন্মের কাছে মতামত প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম এবং সামাজিক আন্দোলন পরিচালনার জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। তথাকথিত আন্দোলন কাঠামোর পরিবর্তে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নতুন সমন্বয়কারী কৌশলগত প্রযুক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

২০১৮-র কোটা সংস্কার আন্দোলন

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তথা তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া আন্দোলনগুলোর একটি হচ্ছে কোটা সংস্কার আন্দোলন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সর্বপ্রথম ১৯৭২ সালে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তী সময় বেশ কয়েকবার এই কোটা ব্যবস্থাটি পরিবর্তন করে সর্বশেষ ৫৫ শতাংশের কোটা করা হয়।

বাংলাদেশে সব ধরণের সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটার ভিত্তিতে নিয়োগের প্রচলিত ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে আন্দোলন শুরু করে চাকরি প্রত্যাশী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা। এপ্রিলে এই আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক পরিচিতি পায় কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের সংগঠন। কোটা সংস্কার আন্দোলনে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা ফেসবুকের মাধ্যমে নিজেদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কোটা সংস্কার আন্দোলন চলাকালে এই গ্রুপে বিভিন্ন ঘোষণা, ছবি, ভিডিয়ো প্রচার করতে আমরা দেখেছি। প্রায় ৮ মাসের নানা কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে পরিণতি পায় আন্দোলনটি। পরবর্তিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে ৪৬ বছর ধরে চলা কোটা ব্যবস্থা বাতিল ঘোষণা করে সরকার।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আরও কিছু আলোচিত ঘটনা

সিলেটের শিশু রাজন, ফেনীর সোনাগাজী মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাতের ঘটনা অথবা শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চ প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমই।

২০১৮ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে আমরা একটি শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলন দেখেছি, যারা নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলন করেছে। বাংলাদেশে নিরাপদ সড়কের দাবিতে এর আগে কখনো এত বড় আন্দোলন হয়নি। এটি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে উদ্ভূত আন্দোলনগুলোর অন্যতম।

সিলেটে শিশু রাজন হত্যা, খুলনায় রাকিব হত্যা, কুমিল্লায় তনু ধর্ষণ ও হত্যা, মিয়ানমারে বিজিবির সদস্যের হাতকড়া পরা ছবি প্রকাশ, মেডিকেলের প্রশ্নপত্র ফাঁস, হজ্ব-তাবলিগ জামাত নিয়ে আবদুল লতিফ সিদ্দিকীর একটি বক্তব্যের ভিডিয়ো, ক্রিকেটার শাহাদাৎ ও তার স্ত্রী কর্তৃক গৃহকর্মীকে নির্যাতনের ছবি, গুলশানের হোলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গি হামলাকারীদের পরিচিতি প্রকাশ এবং সম্প্রতি বুয়েট ছাত্র আবরার হত্যার মতো অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য ঘটনা সামনে চলে আসে। আবার দেশের বাইরে সিরিয় শিশু আয়নাল কুর্দির মৃত্যু, ভারতের মেডিকেল ছাত্রী নির্ভয়াকে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনাগুলোর মতো অনেক ইস্যু আমাদের দেশেও ব্যাপক আলোচিত হয়। নাগরিকরা ক্ষোভে ফুঁসে ওঠেন। অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ ব্যবহারকারীরা নিজেরাই ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে বিভিন্ন ঘটনার বিচার করে ফেলছেন এমনটাও হচ্ছে। বিতর্কিত হলেও অনেকে এটাকে 'সোশ্যাল মিডিয়া ট্রায়াল' বলে অভিহিত করেন।

'সোশ্যাল মিডিয়া ট্রায়াল' নিয়ে ডয়েচে ভেলে ২০১৯ সালের ৩০ আগস্ট অনলাইনে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্ট আরিফ জেবতিক মিন্নির ঘটনাকে নিয়ে মতামত দেন, 'এটাকে সোশ্যাল মিডিয়া ট্রায়াল বলা যাবে না। কারণ, এর মাধ্যমে আসলে বিচার হচ্ছে না। চূড়ান্ত বিচারে সোশ্যাল মিডিয়ার চাপ ভূমিকাও রাখে না। এর মাধ্যমে সরকারের ওপর চাপ পড়ে, প্রশাসনের ওপর চাপ পড়ে নজর দেওয়ার জন্য।' তিনি মিন্নির ঘটনাকে এক্ষেত্রে একটি ক্ল্যাসিক উদাহরণ বলে মনে করেন। তার মতে, 'মিন্নির পক্ষে সামাজিক মাধ্যমের প্রবল চাপ থাকলেও পুলিশ কিন্তু তাকে আটক করেছে। সোশ্যাল মিডিয়া ট্রায়াল হলে কিন্তু তাকে আটক করার কথা নয়।'

একই প্রতিবেদনে, মূলধারার গণমাধ্যমগুলোর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অনুসারী হওয়া ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচিত হওয়ার পর মূলধারার

গণমাধ্যম সেটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে- এমন প্রশ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ড. শামীম রেজা মতামত দেন, 'মূলধারার সংবাদমাধ্যমের একটা নীতিমালা আছে? তাদের সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ আছে? তারা জানেন একজনের ব্যক্তিগত বিষয়ে কতটুকু যাওয়া যাবে। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের সবার সেই প্রশিক্ষণ নেই। ফলে, নাগরিক অধিকার খর্ব হয়। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন হয়। আবার এটা গণতন্ত্রের জন্য যেমন ব্যবহার হয়, গণতন্ত্রবিরোধীরাও তো ব্যবহার করেন।'

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীরা অনেক আলোচিত ইস্যুতে নিজেরাই কখনো কখনো বিচারিক সিদ্ধান্ত দিয়ে ফেলছেন বা জাজমেন্টাল হয়ে ওঠেন। এমনকি ভুল অথবা মিথ্যা তথ্য দিয়েও প্রচার প্রোপাগান্ডা চালানো হয়। ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস-এর মিডিয়া স্টাডিজ ও জার্নালিজম বিভাগের অধ্যাপক সুমন রহমান ওই প্রতিবেদনেই এ প্রসঙ্গে বলেন, 'সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম কখনো আমাদের সঠিক বার্তা দেয়। আবার কখনো জাজমেন্টাল। প্রযুক্তির বিকাশের কারণে আমি এখন এই মিডিয়া নিয়ে উদ্বিগ। কারণ, এটা ব্যক্তির অধিকার ও গোপনীয়তার ওপর আঘাত করছে।'

নাগরিক সাংবাদিকতায় নৈতিকতা ও আস্থার সংকট

অধ্যাপক সুমন রহমানের এই উৎকণ্ঠার পিছনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মূলধারার সাংবাদিকতা চর্চার নীতিহীনতার কারণকেও আমরা উল্লেখ করতে পারি। সাংবাদিকতার নীতিমালা না মানার কারণে তথ্য বিভ্রান্তিতে পড়ছেন গণমাধ্যমের গ্রাহক। এতে করে ওই গণমাধ্যম আস্থার সংকটে পড়ছে।

বাংলাদেশে সংবাদপত্র মূদ্রণ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে একমাত্র প্রেস কাউন্সিল প্রবর্তিত কিছু সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থায় কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আচরণবিধি প্রচলন করে। এসব নীতিমালা সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের পেশাগত কাজে আরও দায়িত্বশীল আচারণ পালনে সাহায্য করছে। এই প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট এর ১১ (বি) ধারায় প্রণীত। এটি ২০০২ সালে সংশোধন করা হয়। কিন্তু অনেক সময়ে সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থাসমূহ এবং সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় এসব আচরণবিধি বা নৈতিকতা মানা হচ্ছে না।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুত খবর প্রচারেও আজকাল রীতিমতো প্রতিযোগিতায় নেমেছে প্রথম সারির গণমাধ্যম আর সেখানেও মানা হচ্ছে না নৈতিকতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. শফিউল আলম ভুঁইয়া ডয়চে ভেলেকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, সাংবাদিকতার সাধারণ নৈতিকতা নিয়ে যদি কথা বলি, তাহলে বলা যায় এখানে তা ঠিকমতো মানা হচ্ছে না। আগে সংবাদ দেয়ার প্রবণতা বা প্রতিযোগিতাও নৈতিকতা না মানার অন্যতম কারণ। তবে এর বাইরে আরও অনেক কারণেই সাংবাদিকতার নৈতিকতা এখানে লঙ্ঘন করা হয়।

মূলধারার গণমাধ্যমের দায়িত্বহীন কিংবা পক্ষপাত আচরণই সনাতন গণমাধ্যমের ওপর মানুষ আস্থা হারাচ্ছে। মূলধারার গণমাধ্যমের জন্য খবরের সন্ধানের এখন অন্যতম উৎস হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। সাধারণ পাঠক-দর্শক প্রতিদিনের খবর কিংবা বিনোদনের জন্য ফেসবুক, ইউটিউবসহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমকে অনুসরণ করছে। পাঠক-দর্শক হারাচ্ছে মূলধারার গণমাধ্যম। যার ফলে কোনো না কোনোভাবে আয়ের দিক দিয়েও লোকসানে পড়তে হচ্ছে মূলধারার গণমাধ্যমকে। টেলিভিশন, রেডিও, পত্রিকা এবং অনলাইন গণমাধ্যমগুলোর আয়ের মূল উৎস বিজ্ঞাপন। আর সেই বিজ্ঞাপন কমছে দ্রুতগতিতে। অন্যদিকে উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্মে নাগরিকদের প্রচার করা ছবি ও ভিডিয়ো জায়গা করে নিচ্ছে পত্রিকার পাতায় কিংবা টেলিভিশনের পর্দায়। এতে করে পেশাগত সাংবাদিকতার প্রতি মানুষের আগ্রহ দিন দিন কমতে শুরু করেছে। এসব কিছুই নাগরিক সাংবদিকতা মূলধারার গণমাধ্যমের জন্য নতুন এক চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও নানামুখী সমস্যা রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিভিন্ন উৎস থেকে প্রতিদিন অজস্র খবর আসতে থাকে। একই বিষয়ে নানাভাবে তথ্যের উপস্থাপন, বিকৃতি অথবা গুজবও ছড়ানো হয়। যেহেতু এই মাধ্যমটি একেবারে উন্মুক্ত তাই তথ্য প্রকাশে এখানে কোনো বাঁধা-নিষেধ নেই। ইন্টারনেটভিত্তিক ওয়েব ২.০ সাইটগুলোর এটাই বৈশিষ্ট্য। যে কেউ চাইলেই যেকোনো ধরনের খবর প্রচার করতে পারে। এ কারণে যেকোনো গুজবের খবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। তাই নাগরিক সাংবাদিকতাতেও নৈতিকতার লঙ্ঘন বা আস্থার সংকট রয়েছে।

ওআরজি-কোয়েস্ট রিসার্চ লিমিটেডের এক জরিপে দেখা গেছে, মতামত প্রকাশ, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, দেশ-বিদেশের খবর, বিনোদন, কেনাকাটাসহ জীবনের প্রায় সবকিছুর জন্য তরুণ-তরুণীরা নির্ভর করছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ওপর। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের মতো সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম তরুণদের কাছে সংবাদের উৎস হয়ে উঠছে। আর এই গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রায়ই ছড়ানো হয় নানা ধরনের গুজব।

২০২০ সালে জানুয়ারি মাসে দৈনিক প্রথম আলোর উদ্যোগে করা তারুণ্য জরিপে অংশ নেওয়া ৭০ শতাংশের বেশি তরুণ-তরুণীদের বক্তব্য ছিল, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলো মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্রতারণা করে এবং 'ফেক নিউজ' ছড়ায়। অর্থাৎ ইন্টারনেট বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম তাদের কাছে বেশি জনপ্রিয় হলেও এই মাধ্যম থেকে পাওয়া সংবাদে খুব একটা আস্থা পাচ্ছেন না তাঁরা।

গুজব নাগরিক সাংবাদিকতাকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমগুলো কীভাবে ইউজার জেনারেটেড কনটেন্টকে কাজে লাগাতে পারে এই বিষয় নিয়ে বর্তমান লেখক কথা বলেছিলেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বিশেষজ্ঞ ভারতীয় বংশোদ্ভূত দক্ষিণ আফ্রিকার সাংবাদিক ও হ্যাশট্যাগ আওয়ার স্টোরিজ এর সহযোগী প্রতিষ্ঠাতা ইউসুফ ওমরের সঙ্গে। ওমর বলেন, 'বাংলাদেশে এখন একটি বড় সমস্যা হলো ভুয়া তথ্যের ছড়াছড়ি। কোথাও আগুন লাগলে মানুষ ছবি বা ভিডিয়ো প্রকাশ করতে শুরু করে। কিন্তু পরে দেখা যায়, সেগুলো বছর তিন-চারেকের পুরনো ফুটেজ। মানুষ মৃত্যু নিয়েও গুজব ছড়ায়। আমি বিশ্বাস করি, এ সমস্যা সমাধানের উপায় গণমাধ্যম শিক্ষার ব্যবস্থা করা। দর্শক-শ্রোতাদের ভুয়া তথ্য চেনার উপায় বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে, যাতে তারা নিজেরা ভুয়া তথ্য না ছড়ান।'

গণপিটুনিতে প্রাণ হারান তাসলিমা বেগম রেনু

২০১৯ সালের ২০ জুলাই রাজধানীর উত্তর বাড্ডায় ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনিতে প্রাণ হারান তাসলিমা বেগম রেনু। সাত থেকে আট মিনিটের মধ্যে তাকে গণপিটুনি ও দেয়ালে মাথা থেঁতলিয়ে হত্যা করা হয়। রেনুকে মেরে ফেলার পরও তার লাশের

ওপর পেটাতে থাকে উত্তেজিত জনতা। আশপাশ থেকে এই ঘটনা অনেকেই মোবাইলে ভিডিয়ো ধারণ করেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মুহূর্তেই ছড়িয়ে যাওয়ায় মূলধারার গণমাধ্যমে এই ঘটনা নিয়ে ফলাও করে খবর প্রচার করতে আমরা দেখেছি। নাগরিক সাংবাদিকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা রেনুকে গণপিটুনি দিয়ে মেরে ফেলার ভিডিয়ো ক্লিপটি দৈনিক প্রথম আলোর ফেসবুক পেজে প্রচার করা হয়। একজন মৃত ব্যক্তির লাশ পিটানোর মতো ঘটনার ভিডিয়ো গণমাধ্যম কি দেখাতে পারে? বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম এখনও এ বিষয়গুলো ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। পরে অবশ্য সমালোচনার মুখে পড়ে প্রথম আলো তাদের ফেসবুক পেজ থেকে ভিডিয়োটি সরিয়ে ফেলে। সাংবাদিকতার নীতিমালা না মানার কারণেই এই ধরণের সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে।

পদ্মা সেতুতে মানুষের 'মাথা লাগার' প্রচারণা গুজব

২০১৯ সালের জুলাই মাসের শুরুর দিকে পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজের জন্য মানুষের মাথা লাগবে বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষ যেন এই গুজবে কান না দেয় সেজন্য পদ্মাসেতুর প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে বাধ্য হয়। সাধারণ মানুষকে সচেতন থাকার আহবান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় যে, পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজে মানুষের মাথা লাগবে বলে যে গুজব ছড়ানো হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পদ্মাসেতু এবং ওই এলাকার মানুষের মধ্যে এ ঘটনায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে বলে বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে খবরও বের হয়।

লবণ সঙ্কটের গুজব

২০১৯ সালের নভেম্বরে লবনের সংকট তৈরি হওয়া নিয়ে দেশে আরও একটি গুজব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ করেই সারা দেশে লবণ কেনার হিড়িক পড়ে। গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করে যে, পর্যাপ্ত পরিমাণে লবণ মজুত রয়েছে। লবণ পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত থাকার বিষয়টি দেশে লবণ বিপণনকারী শীর্ষ চার কোম্পানি গণমাধ্যমকে জানায়। লবণের দাম বাড়া কিংবা সঙ্কট তৈরি হওয়ার খবরটি তাই পুরোপুরি ছিল ভিত্তিহীন। জনমনে অস্থিরতা তৈরি করতেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই গুজবটি ছড়ানো হয়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে

নাগরিক সাংবাদিকরা মূলত স্মার্টফোনসহ বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে থাকেন। সম্ভাব্য সাইবার আক্রমণ থেকে ইন্টারনেটে রক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহারের কলাকৌশল জানা থাকা সবার জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে। ২০২০ সালের জানুয়ারিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ডিজিটাল ডিভাইস, ইন্টারনেট এবং তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা ২০২০ প্রণয়ন করে। এতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আলাদা করে ৯টি নির্দেশনা দেওয়া হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো পোস্ট আপলোড, কমেন্ট, লাইক, বন্ধু বাছাই ও শেয়ার করার ক্ষেত্রে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করা।

২. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরকার বা রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন কোনো পোস্ট আপলোড, কমেন্ট, লাইক, শেয়ার করা থেকে বিরত থাকা।

৩. নিজের অ্যাকাউন্টে অতিরিক্ত আরেকটি ই-মেইল ঠিকানা বা মোবাইল নম্বর যোগ করা যাতে কোনোভাবে অ্যাকাউন্ট হ্যাক হলে পুনরুদ্ধার করা যায়।

নতুন ধারার মিডিয়ার জন্য দরকার প্রশিক্ষিত লোকবল

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমগুলোকে আরও বেশি ইউজিসি কনটেন্ট ব্যবহারের ওপর জোর দিতে বলেছেন হ্যাশট্যাগ আওয়ার স্টোরিজ এর সহযোগী প্রতিষ্ঠাতা ইউসুফ ওমর। তিনি বলেন, বাংলাদেশে এখন ইউজার জেনারেটেড কনটেন্টের ভাণ্ডার তৈরি হয়েছে। নিউজ রুমগুলো যদি এই বিশাল পরিমাণ কনটেন্ট থেকে সুনির্বাচিত কনটেন্টগুলো প্রকাশ করতে পারে, তাহলে একদম নতুন একটি ধারার সূচনা হবে। আমার মনে হয়, এখানে এখনো অনেক সংবাদমাধ্যম ওই মানে পৌঁছাতে পারেনি। ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রামের ভিডিয়ো সম্পাদনা বা ওই জাতীয় কাজের জন্য আলাদা টিম তৈরি করার জন্য আপনাদের এখনো যথেষ্ট লোকবল তৈরি হয়নি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এই প্ল্যাটফর্মের উপযোগী করে মিডিয়া কনটেন্ট তৈরিতে পারদর্শী হওয়ার জন্য দরকার প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ আর প্রশিক্ষণ। কিন্তু বাস্তবচিত্র হচ্ছে আমাদের দেশে এই দু'টোরই বড় অভাব। আর এ কারণে

দেশের মূলধারার গণমাধ্যম এখনও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে পুরোপুরি সুফল ভোগ করতে পারছে না। প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ আর প্রশিক্ষণের অভাব থাকায় অনেকের কাছে নতুন ধারার এই সাংবাদিকতা নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের জন্য নতুন ধারার সাংবাদিকতা বিকাশে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। সমসাময়িক গণমাধ্যমের চাহিদার সাথে মিল রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার বছর মেয়াদি সাংবাদিকতা কোর্সকে আধুনি-কায়ন করতে হবে। পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমগুলো আধুনিক সাংবাদিকতা পেশায় দক্ষ লোকবল ও সংবাদকর্মীদের গুণগত মান বাড়ানোর লক্ষ্যে এ বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করতে হবে।

তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক গণমাধ্যমের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা ভেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশসহ আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতার কোর্স কারিকুলামে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ তাদের মিডিয়া স্টাডিজ ও সাংবাদিকতা বিভাগের স্নাতক পর্যায়ের কারিকুলামকে আধুনিকায়ন করেছে। এরই অংশ হিসেবে সাংবাদিকতার মেজর হিসেবে চালু করেছে ডিজিটাল জার্নালিজম।

২০১৯ সালের অক্টোবরে "বাংলাদেশে সাংবাদিকতার শিক্ষা" শীর্ষক একটি গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ করে ডয়েচে ভেলে একাডেমি। অধ্যাপক জুড উইলিয়াম হেনিইলো, ফাহমিদুল হক ও শামীম মাহমুদের গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সাংবাদিকতা শিক্ষার চিত্র যেমন উঠে এসেছে, তেমন তরুণ গ্রাজুয়েটদের ক্যারিয়ার পথ এবং দেশের শীর্ষ গণমাধ্যমগুলোর বিভিন্ন বিষয়ও রয়েছে।

ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ এর মিডিয়া স্টাডিজ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক জুড হেনিইলো গবেষণা প্রসঙ্গে বলেন, বাংলাদেশে একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাংবাদিকতার শিক্ষা প্রসারিত হচ্ছে, অন্যদিকে বাড়ছে গণমাধ্যমের সংখ্যা। এই দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের ওপর জোর দেওয়া হয় গবেষণায়। মূলত এই গবেষণার ফলাফলের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাদের সাংবাদিকতা কোর্সের আধুনিকায়নের আহবান জানানো হয়। (জুড উইলিয়াম হেনিইলো, ফাহমিদুল হক ও শামীম মাহমুদ, ২০১৯)

সমাপনী প্রতিফলন

আজকাল বিনোদন সংবাদের অন্যতম ইউজিসি সোর্স হচ্ছে ইনস্টাগ্রাম। হলিউড, বলিউড থেকে শুরু করে ঢালিউডের তারকাদের প্রোফাইলে শেয়ার করা ছবি, খবর তৈরির প্রধান উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

নাগরিক সাংবাদিকদের পাঠানো ইউজার জেনারেটেড কনটেন্ট বা ইউজিসি প্রচার করছে দেশের কয়েকটি গণমাধ্যম। উদাহরণ হিসেবে প্রথম আলোর 'নাগরিক সংবাদ' এবং বিডি নিউজ২৪-এর 'নাগরিক সাংবাদিকতাভিত্তিক ব্লগ' প্রকল্পগুলো সাফল্যের সাথে কাজ করছে। আশা করা হচ্ছে, আরও বেশি সংখ্যক গণমাধ্যম ইউজিসি কনটেন্ট প্রচারে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দেবে।

বাংলাদেশে সাংবাদিকরা এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতার কথা বলছেন। মোবাইল ফোন আর কম্পিউটার প্রযুক্তিনির্ভর এই অনলাইন সাংবাদিকতা ধীরে ধীরে বিপুল জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। মূলধারার গণমাধ্যমে সংবাদ তৈরি কিংবা দিনের আলোচিত ঘটনার খোঁজ পেতে সাংবাদিকরা এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ওপর নির্ভর করছেন। সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া একাধিক ঘটনার দিকে তাকালে আমরা এর প্রমাণ পাই যা এই প্রবন্ধে কেস স্ট্যাডি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

করোনা মহামারীর সময় লকডাউন চলাকালে ঘরে বসেই ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোন ব্যবহার করে সাংবাদিকতা চর্চা করার নতুন কৌশল বিশ্ববাসী দেখেছে। বিবিসি, আলজাজিরা, সিএনএন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের মূলধারার ও অনলাইন গণমাধ্যমে সাংবাদিকদের এই কৌশলে খবর প্রচার করতে দেখেছি। এছাড়া ভিডিয়ো কনফারেন্স সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান যেমন- জুম, স্ট্রিম ইয়ার্ড বা ফেসবুক লাইভ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে নাগরিক সাংবাদিকরা খবর প্রচার করেছেন। করোনা সঙ্কটে অসহায় মানুষদের কাছে সিএনজি নিয়ে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া নাফিসা আনজুম খানের উদ্যোগ যখন ফেসবুকে ভাইরাল হলো তখন ওই কর্মসূচির সঙ্গে সামিল হন বাংলাদেশ জাতীয় ওয়ানডে দলের অধিনায়ক তামিম ইকবাল। ফেসবুক থেকে উঠে আসা এই খবর জায়গা করে নেয় প্রথাগত সংবাদমাধ্যমে; প্রচারিত হয় একাধিক প্রতিবেদন। এভাবেই নাগরিক সাংবাদিকতা বাংলাদেশের মূলধারার গণমাধ্যমে সংবাদ তৈরিতে দারুণভাবে প্রভাবিত করছে।

তথ্যসূত্র:

১। খান, আবদুল কাবিল (২০২০), মোবাইল জার্নালিজম সময়ের সাংবাদিকতা সমগ্র প্রকাশন, ঢাকা।

২। প্রথম আলো, ১৯ জুন ২০১৯, অনলাইন লিংক:
[https://www.prothomalo.com/opinion/article/1599975]

৩। বাংলাদেশ জার্নাল, ২৩ অক্টোবর ২০১৯, অনলাইন লিংক:
[https://www.bd-journal.com/social-media/92187]

৪। সোশ্যাল মিডিয়া ট্রায়াল, ৩০ আগস্ট ২০১৯, অনলাইন লিংক:
[https://p.dw.com/p/3Ojbo]

৫। রোসেন, জ্যা, জুলাই ১৪, ২০০৮, সিটিজেন জার্নালিজমের সবচেয়ে কার্যকরী সংজ্ঞা।
অনলাইন লিংক:
[http://archive.pressthink.org/2008/07/14/a_most_useful_d.html]

৬। বিবিসি, ৩ অক্টোবর ২০১৮, অনলাইন লিংক:
[https://www.bbc.com/bengali/news-45728500]

৭। হারুন উর রশীদ স্বপন, ২৭ জুন, ২০১৬, অনলাইন লিংক:
[https://p.dw.com/p/1JDfm]

৮। সরকার ডিজিটাল ডিভাইস, ইন্টারনেট এবং তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা,
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জানুয়ারি ২০২০।
অনলাইন লিংক:
[https://cabinet.gov.bd/site/notices/754986ce-288d-4863-b25c- 9ca57122c311]

৯। প্রথম আলো, ২৯ মে ২০১০, অনলাইন লিংক:
[http://archive.prothomalo.com/detail/date/2010-05-29/news/66916]

১০। চৌধুরী, শামীমা, এপ্রিল-জুন ২০১৭, হলুদ সাংবাদিকতা ও আমাদের গণমাধ্যম নিরীক্ষা,
পিআইবি, পৃ: ৫-৭।

সিকান্দার আবু জাফরের গল্পে গ্রামীণ জীবনের কথকতা

মুহম্মদ মাহমুদুর রহমান

বাংলা কথাসাহিত্যে গ্রামীণ জীবনের কথকতা নতুন কিছু নয়, কথাসাহিত্যিকের চেয়ে কবি হিসেবে বেশি পরিচিত সিকান্দার আবু জাফরও (১৯১৯-১৯৭৫) তাঁর গল্পে গ্রামকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যে সময় সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫) কথাসাহিত্য রচনা করেছেন সেই চল্লিশের দশকের বাংলার সামাজিক জীবন ছিল মূলতই গ্রামকেন্দ্রিক। লেখক-শিল্পীরাও বেড়ে উঠেছেন এই গ্রামীণ সমাজে, অধুনা যুগের মতো ইট-পাথরের দেয়ালে বাঁধা হয়ে তাঁরা লেখেননি। সিকান্দার আবু জাফর কবি হিসেবে সুপরিচিত হলেও তাঁর সাহিত্য-জীবনের শুরু হয়েছিল কথাসাহিত্য দিয়ে, 'পূরবী' (১৯৪১) উপন্যাস দিয়ে। মাত্র বাইশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম বই বেরুলেও এবং তারও অনেক পরে দীর্ঘ সাহিত্য-জীবন পার করার পর ১৯৬৫ সালে প্রথম কবিতার বই 'প্রসন্ন প্রহর' বেরুলেও আমরা তাঁর কথাসাহিত্যের তেমন মূল্যায়ন করিনি, যতটা করেছি 'বাংলা ছাড়ো' (১৯৭১) কবিতার সাহসী কবিকে। সিকান্দার আবু জাফর ষাটের দশকের কবি আর চল্লিশের দশকের কথাসাহিত্যিক। অনুবাদিত গল্পগ্রন্থের কথা বাদ দিলে তাঁর একমাত্র মৌলিক গল্পগ্রন্থ 'মাটি আর অশ্রু' প্রকাশিত হয় চল্লিশের দশকে, ১৯৪২ সালে। চল্লিশের দশকের উত্তাল রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে পাশ কাটিয়ে সিকান্দার আবু জাফর গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে এই গল্পগ্রন্থে সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত গল্প লিখলেন। পরবর্তী জীবনে 'সমকাল'-এর মতো পত্রিকার সম্পাদক ও রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠা এই কবি প্রথম জীবনের সাহিত্যচর্চায় রাজনীতিকে দূরে রেখেছিলেন। বৃটিশ ভারতে এসময়

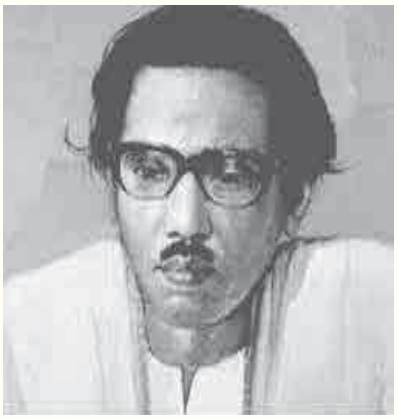

কবি সিকান্দার আবু জাফর

(কবি সিকানদার আবু জাফরের ছবিটি নেওয়া হয়েছে Shatkhira24News.com থেকে)

বজায় ছিল সামন্ত প্রথা। জমিদারি প্রথার নির্মমতার চিত্র গ্রাম-বাংলার সৌন্দর্যের আড়ালে কী রূপ কদর্য হয়ে পাশাপাশি বিরাজ করছিল কবি তাঁর নির্মোহ বর্ণনা করেছেন এই 'মাটি আর অশ্রু' গল্পগ্রন্থে। দরিদ্র মানুষেরা ক্ষুধা ও দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কীভাবে বিপর্যস্ত-বিপন্ন হচ্ছে সেই চিত্র তিনি গ্রন্থটিতে তুলে ধরেছেন। গ্রামের মানুষকে লেখক তথাকথিত সহজ-সরল করে দেখেননি, বরং নিরাসক্তভাবে তাদের কুটিলতা-মূর্খতা-ঈর্ষাকাতরতার চিত্রও তুলে এনেছেন।

'মাটি আর অশ্রু' গল্পগ্রন্থের নামকরণেই পল্লীগ্রামের কথকতার আঁচ পাওয়া যায়। এবং এ কথকতা যে অশ্রু-মেশানো, হাসি-মেশানো নয় সেই আভাসও পাওয়া যায়। তাই, আমরা দেখি, গল্পগ্রন্থটির দশটি গল্পের প্রায় সবগুলোই বিয়োগান্তক। প্রায় প্রতিটি গল্পেই মৃত্যুর মর্মবেদনা আছে; আছে নির্মম দারিদ্র্য, আত্মহত্যা কিংবা হত্যা। আর এ নির্মম কষ্টের জীবনের সঙ্গে কারণ হিসেবে মিশে আছে সামন্তপ্রথা।

'পূর্বাভাস' গল্পে গ্রামীণ জীবনের এক নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের প্রসঙ্গ এসেছে। রত্না, তন্দ্রা, তাদের মা দিবাময়ী, বাবা নিশানাথবাবু-সব মিলিয়ে নয় পুত্র-কন্যাসহ এগারো জনের এক বিশাল সংসার। জনসংখ্যা আছে যথেষ্ট, সেই তুলনায় অর্থসঙ্গতি আছে যৎসামান্য। প্রধান এবং অপরিহার্য চাহিদা খাদ্যগ্রহণের জন্য তাদের নির্মম হিসাব-নিকাশের মধ্য দিয়ে চলতে হয়। অভাব তাদের হাসি পুরোপুরি কেড়ে নিয়েছে, বিনিময়ে দিয়েছে চড়া ভালোবাসা-বর্জিত মেজাজ। গল্প থেকে পাই, দিবাময়ী বলছে কন্যা রত্নাকে-

"ধিঙ্গি মেয়ে, কাপড় ছিড়তে পারো, গলায় দড়ি দিতে পারো না?" (সি. আ. জাফর, ১৯৯৯ : ৩)

কিংবা- "কঞ্চির খোঁচা লেগে তোর হৃৎপিণ্ডটা ফুটো হয়ে গেলো না কেন হারামজাদী?" (সি. আ. জাফর, ১৯৯৯ : ৩)

তাদের জীবনে অপচয়ের কোনো সুযোগ নেই, অসতর্কতায় কঞ্চির খোঁচায় রত্নার কাপড় ছিঁড়তে পারবে না, মনের ভুলে চুলায় বসানো ভাত পুড়তে দেওয়া যাবে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'-র কুবের একটিমাত্র দেশলাইয়ের কাঠি খরচ করে কীভাবে হুঁকো ধরাতে হয় তা জানে, কারণ নির্মম দারিদ্র্য দেশলাইয়ের সামান্য একটা কাঠিও অতিরিক্ত খরচ করবার বিলাসিতাটুকু তাকে করতে দেয়নি।[১]

সিকান্দার আবু জাফর যুক্তিবাদী মন দিয়ে সমাজের দারিদ্র্য দেখেছেন। তাই তিনি দেখিয়েছেন যে এগারো সদস্যবিশিষ্ট নিশানাথ বাবুর সংসারে মানুষের মূল্য বস্তুগত সম্পদের চেয়ে কম, মানব-সম্পদ বিসর্জন দিয়ে বস্তুগত সম্পদ রক্ষা করাটা শ্রেয়তর মনে হয়। রত্না লিখল তার শেষ চিঠিতে-

"মৃত্যু সকল লজ্জা ঢেকে দেয় বলেই বাড়ি থেকে বিবসনা হয়েই চললুম। কারণ, আমি জানি যে, আমাকে হারানোর ক্ষতি তোমরা স্বীকার করতে পারো, কিন্তু কাপড়খানা হারাবার ক্ষতি তোমাদের পক্ষে অসহ্য।" (সি. আ. জাফর, ১৯৯৯ : ৫)

১. "ছইয়ের গায়ে আটকানো ছোট হুঁকাটি নামাইয়া টিনের কৌটা হইতে কড়া দা-কাটা তামাক বাহির করিয়া দেড় বছর ধরিয়া ব্যবহৃত পুরাতন কল্কেটিতে তামাক সাজিল কুবের। নারিকেল ছোবড়া গোল করিয়া পাকাইয়া ছাউনির আড়ালে একটিমাত্র দেশলাইয়ের কাঠি খরচ করিয়া সেটি ধরাইয়া ফেলিল।" --মামুদ, হায়াৎ (সম্পাদনা)। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ঢাকা : অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৫। পৃ. ৩২৬।

'বাপের বাড়ি' গল্পটি ছোট পরিসরের। বিয়ের পর এখনকার মতো তখনো কন্যা নিজের বাপের বাড়ি ছেড়ে স্বামীর বাপের বাড়ি বা স্বামীর বাড়ি যেত, গল্পের মনোয়ারাও যায় মাত্র ষোল বছর বয়সে। তখনকার সমাজে বাংলাদেশের নারীর অবস্থা ছিল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার মতোই করুণ, সংসারে-সমাজে তাদের দুরবস্থা ও চরম দাস্যভাব কোনো লুকোছাপার ব্যাপার ছিল না। প্রজাপতির দুই পক্ষ- কন্যাপক্ষ আর বরপক্ষের দ্বন্দ্বের বলী মনোয়ারা আর বাপের বাড়ি যেতে পারে না। তাই বাপের বাড়ির মাটি-বাতাস-ছায়া-হিজলতলার পুকুরভরা পানির কাছে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষায় মনোয়ারা গুমরে গুমরে মরে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বলীয়ান পৌরুষ মনোয়ারার বিবাহিত জীবনের বাপের বাড়ি যাওয়ার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাকে হত্যা করেছে। যেমন মনোয়ারার স্বামীর দাম্ভিকতা, তেমনি মনোয়ারার বাবারও বীর্যবত্তা- দু'য়ের কেউ কারও কাছে মাথা নত করেনি। বীরপুরুষ স্বামী যেমন স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠায়নি তেমনি লৌহপুরুষ মনোয়ারার বাবাও নিজ কন্যাকে আনতে জামাইয়ের বাড়ি যায়নি। যে দাম্ভিক পিতা তার দম্ভের লয় ধরে রাখতে কন্যাকেও বিসর্জন দিতে পারে সেখানে স্বামীর দাম্ভিকতা সহজেই মানানসই।

‘বিষাক্ত পৃথিবী’ গল্পের হালিমা গলায় দড়ি দেয়, কারণ দারিদ্র্য ও ক্ষুধা তার সম্ভ্রম কেড়ে নিয়েছিল। কাদের ও হালিমা বিবাহিত জীবনে চার পুত্র-কন্যার জনক-জননী হয়ে “নির্মম দারিদ্র্যের ক্ষমাহীন স্বেচ্ছাচারিতা” (সি. আ. জাফর, ১৯৯৯ : ১৫) দেখতে পায়। দারিদ্র্যের এই নির্মমতা এরূপ-

“সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়াও দু’বেলা আহার জোটা মুশকিল, তার উপরে ছেলে-মেয়েদের অসুখ, জমিদারের খাজনা, মহাজনের দেনা শোধ। কাদের দিন গুণিতে লাগিল, কত দিন পরে তার মুত্যু হইবে।” (সি. আ. জাফর, ১৯৯৯ : ৫)

দরিদ্রকে দরিদ্র করবার যে ধনিক নীতি তার প্রবল প্রয়োগ আমরা লক্ষ্য করি সিকান্দার আবু জাফরের গল্পগুলোতে। মীর মশাররফ হোসেনের ‘জমিদার দর্পণ’ পড়ে আমরা দরিদ্র প্রজা আবু মোল্লার সুন্দরী বৌ নুরন্নেহারের পরিণতির কথা জানতে পারি। আবু মোল্লার বৌ নুরন্নেহারের উপর চোখ পড়েছিল জমিদার হায়ওয়ান আলীর, আর এই চোখ পড়ার দরুণ গর্ভবতী হয়েও নুরন্নেহার ধর্ষণ থেকে রক্ষা পায়নি। ‘বিষাক্ত পৃথিবী’ গল্পের হালিমাও রক্ষা পায়নি জমিদারের ক্রূরতা থেকে, পার্থক্য- নুরন্নেহারের মৃত্যু হয়েছে ধর্ষণে, হালিমা স্বেচ্ছামৃত্যু বেছে নিয়েছে।

ভিলেজ পলিটিক্স শব্দটির সঙ্গে আমরা পরিচিত, এই পলিটিক্সের চরম নিম্নমানের সঙ্গেও আমাদের কমবেশি সখ্য আছে। গ্রামের মানুষ সহজ-সরল নয়, ভালো নয় শহরের মানুষের চেয়ে, বরং তাদের কুটিলতা বেশ নগ্ন, ঈর্ষা সর্বগ্রাসী। একারণেই ‘মাটির মায়া’ গল্পের সুস্থ-সবল-সুকুমার মনসুর তার বাপ-দাদার ভিটা রক্ষা করতে পারেনি। প্রবল ঈর্ষাপরায়ণ প্রতিবেশির হাতে অকালে মারা যেতে হয় মনসুরকে।

বাপ-দাদার ভিটা ছেড়ে বাধ্য হয়ে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত মনসুর যখন পুনরায় নিজ দাবি পূরণের লক্ষ্যে পৈতৃক ভিটায় ফিরে আসে তখন সে প্রতিবেশিদের উষ্ণ অভ্যর্থনার বদলে তাদের বাঁকা চাহুনি দেখেছে। “ফুটন্ত চায়ের কেটলির গরম ধোঁয়ার মতো নিমেষে অনন্ত মহাশূন্যে মিলাইয়া” (সি. আ. জাফর, ১৯৯৯ : ৮) যাওয়া লুপ্ত চৌধুরিদের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে মনসুরকে স্বাভাবিক সাহায্য করবার বদলে তার প্রতিবেশিরা তার আগমন দেখে চিন্তাগ্রস্ত হয়। যার আর ফিরে আসার সম্ভাবনা ছিল না, তার ফিরে আসা গ্রামবাসীর কাছে স্বার্থবিরোধী সমস্যা মনে হয়। তাই যে চৌধুরি বংশ এখন লুপ্তপ্রায় সেই বংশের পুনরুত্থান যদি চৌদ্দ বছরের

বালক মনসুরের মধ্য দিয়ে হয় তবে এত বড় ধৃষ্টতা সহজ-সরল গ্রামবাসী মেনে নিবে কেন? গ্রামবাসী মেনে নেয়নি, মনসুরকেও তাই জীবন দিতে হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঈশ্বর তবুও তো ভদ্রপল্লীতে বাস করেন১, সিকান্দার আবু জাফরের আছে সংশয়- "তবুও-তবুও ন্যায়বিচারক, দীন দরিদ্রের প্রতিপালক সত্যদ্রষ্টা সেই খোদা বর্তমান আছেন!" (সি. আ. জাফর, ১৯৯৯ : ১৩)

মনসুরের মতো 'প্রতিক্রিয়া' গল্পের শমীমের মধ্যেও দ্রোহচেতনা দেখা যায়। শমীম চাষার ছেলে হয়েও শিক্ষিত, কিন্তু বৈষম্যকামী জমিদারশ্রেণি তার এ শিক্ষিত হয়ে ওঠাকে মেনে নেয় না, প্রজার রাজা হয়ে যাওয়ার বাসনা তারা কেনই বা মেনে নিবে। তাই শমীমকে গায়ের কাপড় ছিঁড়ে ফেলে বিবস্ত্র-বন্য হয়ে ঘোষণা করতে হয়-

"বেশ তাই হোক। চাষার ছেলে, নিরক্ষর বন্যের মতোই আমার জীবন তোমাদের কাছে ত্রাসের হয়ে উঠুক।" (সি. আ. জাফর, ১৯৯৯ : ৫৬)

অতি কষ্টে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হয়ে ওঠা শমীম 'প্রতিক্রিয়া' গল্পে পুনরায় বুনো-বর্বর-অশিক্ষিত চাষা হয়ে যেতে চেয়েছে, নির্ভেজাল শয়তান জমিদারদের কাছে ত্রাস হতে চেয়েছে, দ্রোহের স্ফুলিঙ্গ রচনা করতে চেয়েছে।

১."ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।" - মামুদ, হায়াৎ (সম্পাদনা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৫। পৃ: ৩৩০।)

'মাটি আর অশ্রু' গল্পের অপরাপর গল্পের মতোই 'প্রতিক্রিয়া' গল্পেও আছে সামন্ত প্রভুদের নিগ্রহের চিত্র, আছে নারীর প্রতি চরমতম অবমূল্যায়ন। শমীমের মা স্বামীহারা সাবেরা জমিদারের বাড়িতে পেটের দায়ে ঝি-গিরি করতে এসে ইজ্জত-আব্রু সব খুঁইয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করতে থাকে। শেষতক তার করুণ মৃত্যুও হয় চুরির দায়ে। মায়ের করুণ মৃত্যু শমীমকে আহত করে, ক্ষিপ্ত করে, চাষা থেকে ভদ্রলোক হতে চাওয়া শমীম পুনরায় বর্বর হয়ে যায় ছদ্মবেশী বর্বরদের বর্বরতার প্রতিশোধ নিতে।

মনসুরকে জীবন দিতে হয়েছে, শমীমকে বন্য হতে হয়েছে, দ্রোহচেতনার এই ধারাবাহিকতা 'শাস্তি' গল্পের গফুরের মধ্য দিয়ে সফল প্রকাশ ঘটে। গফুরের স্ত্রী রাবেয়া সুন্দরী- এই অপরাধে গফুরকে অহংকারী তকমা লাগিয়ে গ্রামে একঘরে করা

হলো। একঘরে করার পরেও গফুর সত্যিকার অহংকার, পৌরুষ নিয়ে টিকে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে যায়। কিন্তু, কোনো এক কূটিলজন গফুরের অন্ন-যোগানদাতা একটা গরুকে মেরে ফেলল বিষ খাইয়ে। এরপর গফুর সংগ্রাম করতে করতে এক সময় হার মানল। ক্ষুধা বড়লোকদের এমন এক ব্রহ্মাস্ত্র যে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার নয়। ক্ষুধার্ত-দুর্বল-দরিদ্র প্রজাদের জমিদাররা হাতেই মারতে পারে, কোনো কোনো সবল-প্রতিবাদী প্রজাকে ভাতে মারার পরিকল্পনা করতে হয়। গফুর সুন্দরী রাবেয়াকে বিয়ে করে অহংকার প্রদর্শন করেছে, জমিদারের নায়বকে মারধর করেছে, একঘরে করেও তাঁকে বিপর্যস্ত করা যায়নি; অতএব, তাকে আর্থিকভাবে পঙ্গু করার নীলনকশা করতে হবে। সামন্তবাদ তার শত্রুদের মাত্রা বুঝে এভাবেই শায়েস্তা করে থাকে, তাই অহংকারী গফুরকেও বলতে হয় একসময়-

"ক্ষিধে, ক্ষিধে আর ক্ষিধে। ওরে, আমারও কি ক্ষিধে লাগে না।" (সি. আ. জাফর, ১৯৯৯: ১৯)

গফুর তার দুই সন্তানকে বিষ খাইয়ে চিরমুক্তি দেয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকে অভাবী আমেনা তার সন্তানকে গলা টিপে মারে। আমেনার বিরুদ্ধে মামলা হয়, গফুরের বিরুদ্ধেও। গফুর সিকান্‌দার আবু জাফরের অন্য চরিত্রগুলোর চেয়ে ব্যতিক্রম একারণে, সে গ্রাম্য ভিলেনদের বাসায় আগুন দিতে পেরেছিল খুনের দায়ে ধরা পড়বার আগে। মরার আগেই মরে যাওয়া দরিদ্র মানুষগুলোর মধ্যে দ্রোহচেতনা খুব কমই দেখা গিয়েছে 'মাটি আর অশ্রু' গল্পগ্রন্থে। 'মাটির মায়া'র মনসুরের মধ্যে বিদ্রোহের তেজ দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু সামন্ত প্রভুরা তাকে আর আগে বাড়তে দেয়নি। তাকে অকালে, মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে সময়ের আগেই চলে যেতে হয়েছিল। শমীমের মধ্যেও অশনী সংকেত দেখা দিয়েছিল। কিন্তু গফুর ব্যতিক্রম, সে মেরে মরেছে, ধুঁকে ধুঁকে মরেনি বা প্রতিবাদহীন আত্মহত্যা করে সমাজপতিদের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দেয়নি।

'গ্রন্থি' গল্পে লেখক ঐক্যের জয় দেখিয়েছেন। এই গল্প জয়ের গল্প, অপরাপর গল্পের মতো জীবনযুদ্ধে পরাজয়ের গল্প নয়। গফুরের মতোই বলশালী তিন ভাইয়ের গ্রন্থির টান কীভাবে বড় শত্রুকেও পরাস্ত করে দিতে পারে তা এক তৃপ্তিময় পরিসমাপ্তির মধ্য দিয়ে সিকান্‌দার আবু জাফর ফুঁটিয়ে তুলেছেন। গল্প থেকে-
"গ্রামের লোক প্রতিহিংসাপরায়ণ। প্রতিবেশির সৌভাগ্যকে অকারণেই তারা হিংসা করে।" (সি. আ. জাফর, ১৯৯৯ : ৩৩)

তিন ভাই, জমির-কবির-ফকির, তাদের সাজানো চমৎকার জীবন, তাদের অসাধারণ ঐক্য ও মানসিক-শারীরিক বল- এসবই গ্রাম্য প্রতিবেশিদের মাথাব্যথার কারণ। সুতরাং গ্রামাঞ্চলের 'সহজ-সরল' মানুষের তৈরি স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী তিন ভাইয়ের ঐক্য ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য তিন ভাইয়ের কানেই নানারকম বাতাস ভেসে বেড়াতে লাগল এবং অভ্রান্ত অস্ত্র ব্যর্থ হলো না, তিন ভাইয়ের ঐক্যে ফাটল ধরল।

কিন্তু বিপদের সময় তিন ভাইয়ের পুনরায় এক হয়ে যাওয়াটা এই গল্পের এক অসাধারণ চমক। টানা বিয়োগান্তক গল্প পড়তে পড়তে পাঠক যেখানে এই গল্পেরও বিয়োগান্তক সমাপ্তি আশা করছিলেন তারা হঠাৎ দেখলেন গল্পটিতে নায়কেরা জয়ী হয়েছে, ভিলেনেরা হেরে গিয়েছে। জমিদারের বাহিনির বিরুদ্ধে তিন ভাই প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে, বাপ-দাদার জমিতে উৎপন্ন ধান রক্ষা করে। 'গ্রন্থি' গল্পের নামকরণও সার্থক। এ গ্রন্থি রক্তের টান; কোনো বাধাই, তা পর্বতসমানই হোক, গ্রন্থি ভাঙতে পারবে না কোনোভাবেই। তিন ভাইকে এক করেছে গ্রন্থির টান, তাই স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে আলাদা হয়ে যাবার পরও অন্তিম মুহূর্তে ঠিকই গ্রন্থিতে টান পড়েছে। তাই দশ-বারোজন লাঠিয়ালের দলকে মাত্র তিন ভাই মিলেই রুখে দিতে পেরেছে, রক্ষা করতে পেরেছে ময়না দিঘীর সকল ধান।

সিকান্দার আবু জাফর ভিলেজ পলিটিক্স স্বচক্ষে দেখেছেন। তিনি জানতেন সামন্ত শ্রেণি নিজেদের স্বার্থে প্রজাদের এক থাকতে দেয় না। আবার এ-ও সত্য, গ্রামবাসীর অনৈক্যের পিছনে তাদের নিজেদের অর্জিত মূর্খতাও দায়ী। 'গ্রন্থি' গল্পে লেখক এই বার্তা দিয়েছেন যে ঐক্য জয় ডেকে আনে, অনৈক্য পরাজয়।

'মাটি আর অশ্রু' বইয়ে প্রেমের গল্পও আছে, 'রূপার আংটি' ও 'কাহিনী' প্রেমের গল্প। প্রেমের গল্প হওয়ায় সিকান্দার আবু জাফর গল্পগুলোতে দারিদ্র্যের নির্মমতা ও দরিদ্রদের সামাজিক দুরবস্থার চিত্র অপরাপর গল্পের মতো আঁকেননি, তবে দুঃখ যেহেতু গল্পগ্রন্থটির মূল স্রোত, তাই প্রেম পূর্ণতা পায়নি, বিয়োগান্তক হয়ে শেষ হয়েছে। 'রুপার আংটি' গল্পের কাশেম ও আমিনার প্রেম ছিল ছোটবয়স থেকেই। কিন্তু বিচক্ষণ আমিনার বাবা দীনমজুর কাশেমের সঙ্গে নিজ কন্যার বিয়ে দেওয়ার আগে কাশেমকে এক বছরের সময় সাপেক্ষে অবস্থাপন্ন হবার শর্ত জুড়ে দিল। গ্রামীণ সমাজে তখন অবস্থাপন্ন অর্থ হলো, "অন্তত দু'খানা ভাল ঘর বাঁধিতে হইবে এবং নিজের লাঙল-গরু করিতে হইবে।" (সি. আ. জাফর, ১৯৯৯ : ২৩)

কিন্তু প্রায় সফল কাশেম শেষপর্যন্ত আমিনার কাছে নির্ধারিত সময়ে পৌঁছাতে পারেনি, মারা যায় সড়ক দুর্ঘটনায়। ইতোমধ্যে বিবাহিত আমিনার কাছে রয়ে যায় কাশেমের দেওয়া প্রেমের চিহ্ন একটা রুপার আংটি, যেখানে আমিনার নাম লেখা ছিল 'মীনা'। সদ্য বিবাহিত জীবনে কাশেমের দেওয়া এ রুপার আংটি আমিনার কাছে যেন "হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগিয়ে"১ তোলা।

অপর প্রেমের গল্প 'কাহিনী'-র আঙ্গিক একটু ব্যতিক্রম। গল্পটিকে পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় ব্যতিরেকেই গল্পকার ৬টি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রদীপ, তমসা, ইন্দ্রতীর্থ, পরিচয়, সমস্যা ও নিষ্পত্তি- এই ৬টি ভাগে গল্পটি এক চমৎকার ঐক্যের মধ্য দিয়ে রচিত হয়েছে। বড় পুকুরে গল্পের নায়ক ডাক্তার প্রদীপ যখন পা ধুতে আসে তখন পুকুরে জল নিতে আসা নায়িকা তমসার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় ঘটে। জল নিতে কলসি নিয়ে পুকুরঘাটে আসা তমসা, প্রদীপের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়, প্রেম-বিরহ এসব আমাদের মনে করিয়ে দেয় মৈমনসিংহ গীতিকার মহুয়া ও নদের চাঁদকে।

তমসা তার নপুংশক স্বামীর সঙ্গে ঘর করে এসেছে, একে নিয়তি হিসেবে মেনে নিয়েছে, গ্রামীণ সমাজের চাপিয়ে দেওয়া প্রথা হিসেবে দেখেনি। কারণ তমসা একজন সাধারণ প্রজা, দাম্ভিক জনতাও নয়, আবার প্রথাকে অস্বীকার করবার মতো বড় মানুষও নয়। সমাজের বড় মানুষ ডাক্তার প্রদীপ তাই দ্বিধাহীনভাবে তমসাকে প্রেম নিবেদন করতে পেরেছে, মাঝারি মানুষ তমসা সে নিবেদন গ্রহণ করতে পেরেছে, কিন্তু প্রথার উর্ধ্বে যেতে পারেনি। ফলে প্রথা থেকে বের হতে না পারার দুঃখে এবং প্রদীপকে না পাবার আক্ষেপ থেকে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

গল্পে ক্রিকেট প্রসঙ্গ আছে। এছাড়া-

"পথ-ঘাট নির্মাণ, জঙ্গল পরিষ্কার, ব্যায়ামাগার স্থাপন, ফুটবল টিম গঠন, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, মেয়েদের অবৈতনিক প্রাইমারি স্কুল মিলিয়া গ্রামে একটা দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। বৃদ্ধেরা হাঁপাইয়া উঠিলেন। ছেলেরা তাদের বংশানুক্রমিক আলস্য ত্যাগ করিয়া গা-ঝাড়া দিয়া উঠিল।" (সি. আ. জাফর, ১৯৯৯ : ৪৪)

১. "পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে।" (জীবনানন্দ দাশের কবিতাসমগ্র, মৌ প্রকাশনী, পৃ. ১১৮)